লেভ তলস্তয়

শিশু কাহিনী

Л. Н. Толстой

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Т $\frac{70802—454}{014(01)—81}$ 707—81 4803010101

মহান রুশ লেখক লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) ছোটোদের জন্যে কয়েকটি অপূর্ব কাহিনী রচনা করেন যা বিশ্বসাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডারে স্থান লাভ করেছে।

ছোটোদের জন্যে প্রকাশিত এই বইটিতে তলস্তয়ের শ্রেষ্ঠ শিশু কাহিনীগুলি দেওয়া হল। ছবি এঁকেছেন আকাদেমিশিয়ন আ. পাখোমভ।

লেভ তলস্তয়

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: আ. পাখোমভ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো
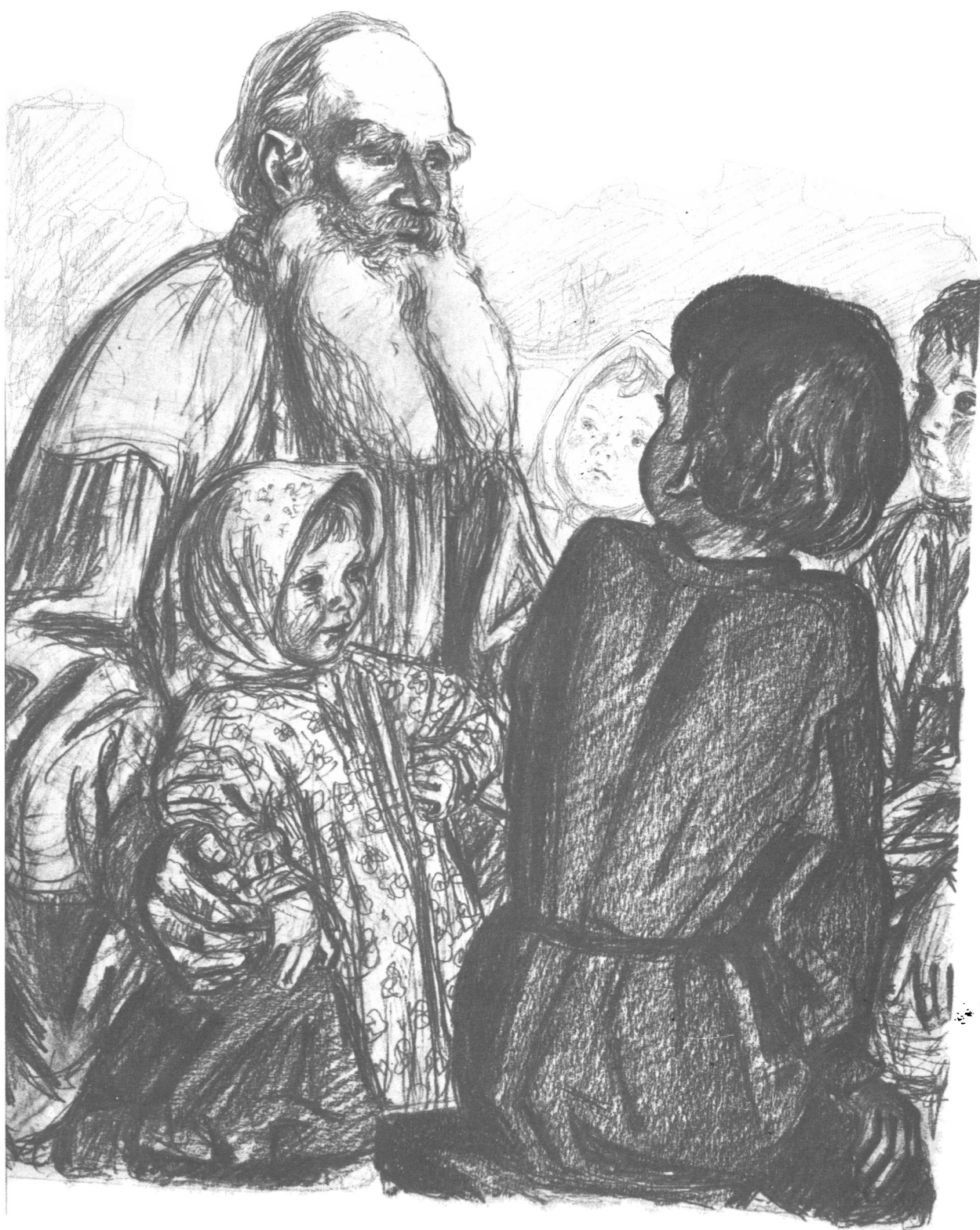
বেড়ালছানা

ভাসিয়া আর কাতিয়া দুই ভাই-বোন। তাদের একটি বেড়াল। বসন্তের সময় বেড়ালটি হারিয়ে গেল। সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করলে দুটিতে, কিন্তু পেলে না।

একদিন গোলাঘরের কাছে খেলছে, শোনে মাথার ওপর কে যেন মিউমিউ করছে ক্ষীণ স্বরে। ভাসিয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠল গোলার ওপরে। নিচে দাঁড়িয়ে কাতিয়া কেবলি জিজ্ঞেস করছিল, 'পেয়েছিস, পেলি?'

ভাসিয়া কিন্তু প্রথমটা কোনো জবাব দিল না। শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে বললে:

'পেয়েছি! আমাদের বেড়ালটাই... বাচ্চা হয়েছে, কী সুন্দর! শিগগির আয়!'

কাতিয়া দৌড়ে বাড়ি গিয়ে দুধ নিয়ে এল বেড়ালের জন্যে।

বাচ্চা হয়েছিল পাঁচটি। খানিকটা বড়ো হয়ে বাচ্চাগুলো যখন তাদের কোণটি ছেড়ে বেরুতে শিখল, তখন শাদা থাবাওয়ালা ছেয়ে রঙের একটি বাচ্চাকে ওরা নিয়ে এল বাড়িতে। বাকি বাচ্চাগুলোকে মা বিলিয়ে দিলেন, এটিকে রেখে দিলেন ছেলেমেয়েদুটির জন্যে। তারা তাকে খাওয়াত, তার সঙ্গে খেলত, সঙ্গে নিয়ে শুত।

একদিন ওরা রাস্তায় খেলতে গেল, বেড়ালছানাটিকেও সঙ্গে নিলে।

বাতাসে খড় নড়ছিল রাস্তায়, খড়ের সঙ্গে খেলা জমাল বেড়ালছানা, দেখে ভাই-বোন দুটির ভারি আনন্দ। তারপর রাস্তার কাছে 'শ্যাভেল' শাক দেখতে পেয়ে তারা বেড়ালছানার কথা ভুলে শাক তুলতে লেগে গেল।

হঠাৎ কানে এল কে যেন চ্যাঁচাচ্ছে, 'ফের! ফের বলছি!' দেখে এক শিকারী ঘোড়ায় চড়ে আসছে, আগে আগে দুই কুকুর, বেড়ালছানাটা দেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করছে।
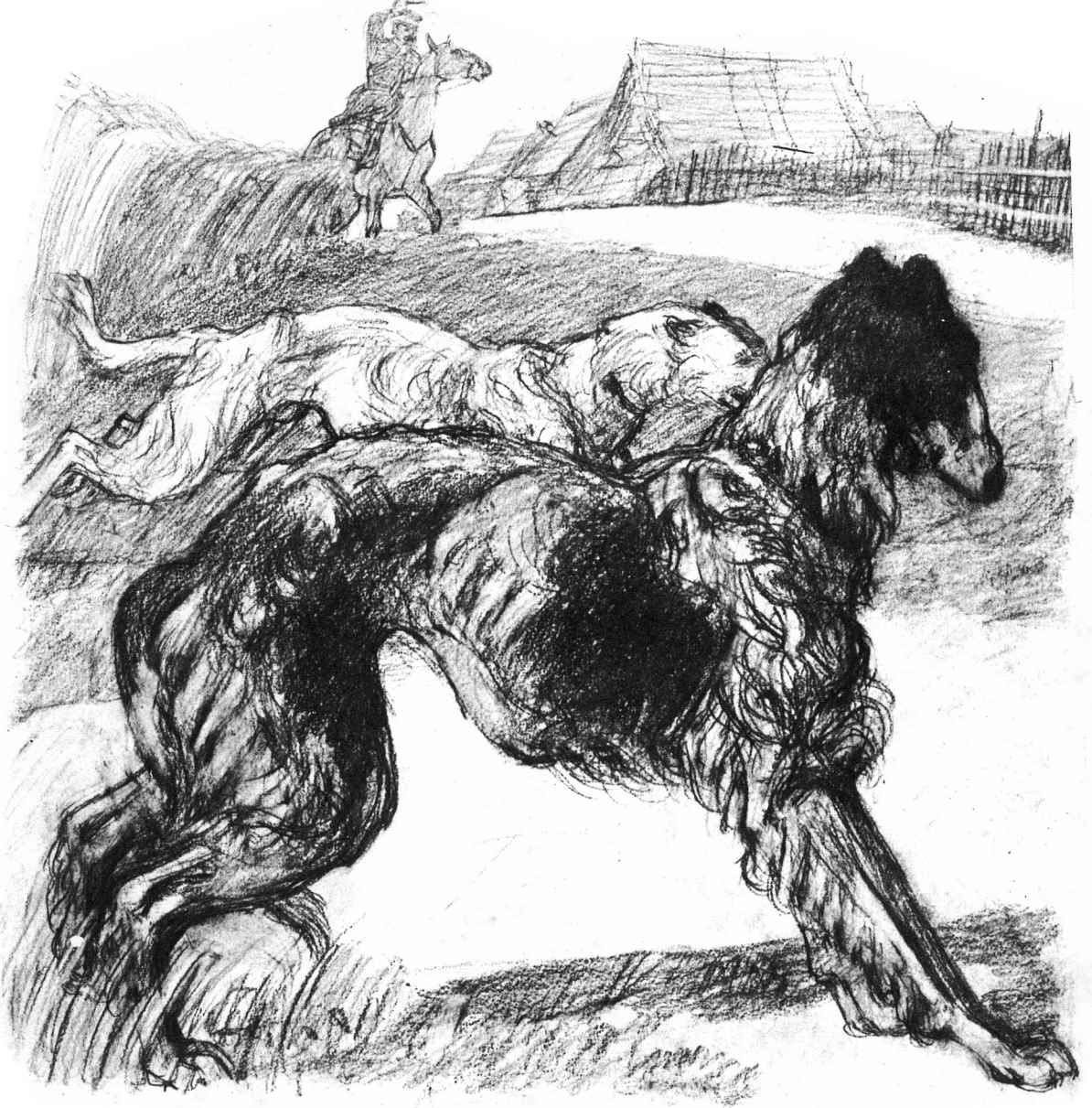
বেড়ালছানাটা একেবারে বোকা, ছুটে না পালিয়ে গিয়ে সেটা মাটিতেই বসে পিঠ কুঁজো করে চেয়ে রইল কুকুরগুলোর দিকে।

কুকুর দেখে ভয় পেয়ে গেল কাতিয়া, চিৎকার করে ছুটে পালাল সে। ভাসিয়া কিন্তু প্রাণপণে দৌড়ে গেল বেড়ালছানার দিকে, কুকুরদুটো একই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছল সেখানে।

বেড়ালছানাটাকে ছোঁ মারতে চেয়েছিল কুকুরদুটো, কিন্তু ভাসিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখল তাকে।

শিকারী ছুটে এসে কুকুর তাড়িয়ে নিয়ে গেল, ভাসিয়াও বাড়ি নিয়ে এল বেড়ালছানাকে, আর কখনো তাকে মাঠে নিয়ে যায় নি।

খুকি আর ব্যাঙের ছাতা

ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরছে দুটি মেয়ে।

পথে রেল লাইন পেরতে হয়।

ভাবলে, গাড়ি অনেক দূরে, বাঁধে উঠে রেল লাইন পেরতে লাগল।

হঠাৎ গাড়ির শব্দ শোনা গেল। বড়ো মেয়েটি ছুটল পিছন দিকে, আর ছোটোটি ছুটে গেল লাইন পেরিয়ে।

বড়োটি চেঁচিয়ে বললে বোনকে, 'ফিরে আসিস না কিন্তু!'

কিন্তু গাড়ি তখন কাছে এসে পড়েছে, এমন তার আওয়াজ যে ছোটোটির কানে সে কথা ভালো গেল না। ভাবলে, তাকে ফিরে আসতে ডাকছে। রেল লাইন পেরিয়ে ফের সে ছুটল পেছন দিকে, কিন্তু হোঁচট খেয়ে ব্যাঙের ছাতা পড়ে গেল, কুড়তে শুরু করল সে।

গাড়ি তখন একেবারে কাছে, প্রাণপণে হুইসিল দিলে ড্রাইভার।

বড়ো বোন চেঁচিয়ে উঠল, 'ছেড়ে দে ব্যাঙের ছাতা!' কিন্তু ছোটোটি ভাবলে তাকে বুঝি কুড়তেই বলছে, রেল লাইনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারল না। আপ্রাণ হুইসিল দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল মেয়েটির ওপর।

বড়ো বোন চেঁচিয়ে উঠে কাঁদতে লাগল। যাত্রীরা সবাই গাড়ির জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলে, কন্ডাক্টর ছুটে গেল গাড়ির শেষ প্রান্তে, মেয়েটির কী হল দেখতে।

গাড়ি চলে যেতে সবাই দেখল মেয়েটি দুই লাইনের মাঝখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে, নড়ছে না।

তারপর ট্রেন যখন অনেক দূরে চলে গেছে, তখন মাথা তুললে মেয়েটি, হাঁটু মুড়ে বসে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে ছুটে গেল দিদির কাছে।
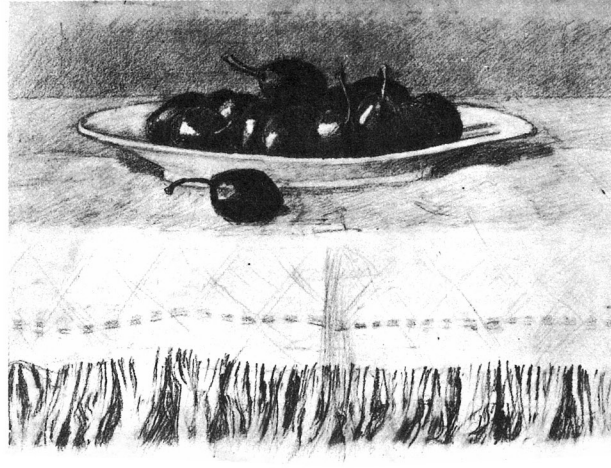
আঁটি

কুল কিনলে মা, ভেবেছিল খাওয়ার পর ছেলেদের দেবে।

কুলগুলো ছিল ডিশে। ভানিয়া আগে কখনো কুল খায় নি, কেবলি গন্ধ শুঁকতে লাগল। ভারি ভালো লাগল তার। ভারি ইচ্ছে হল খায়। কেবলি সে কুলের আশেপাশে ঘোরে। ঘরে যখন কেউ নেই তখন সে আর পারল না, একটা কুল নিয়ে খেলে।

খাবার আগে মা গুনে দেখে একটা কুল নেই। বাবাকে বললে সে কথা।

খাবার সময় বাবা বললে, 'কী রে, একটা কুল তোরা কেউ খেয়েছিস নাকি?'

সবাই বলে, 'না তো।'

ভানিয়াও একেবারে গলদা-চিংড়ির মতো লাল হয়ে বললে, 'না, আমি খাই নি।'

বাবা তখন বললে, 'তোরা কেউ যদি খেয়ে থাকিস তবে সেটা কিন্তু ভালো হয় নি। তবে আসল কথা সেটা নয়। সর্বনাশের ব্যাপার এই যে কুলের আঁটি আছে, আর খেতে না জেনে কেউ যদি আঁটি গিলে বসে, তবে পরের দিনই সে মারা যাবে। এইটেই হল ভয়ের কথা।'

ভানিয়া ফ্যাকাশে হয়ে বলল, 'না, না, আঁটি আমি জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।'

হেসে উঠল সবাই আর ভানিয়া কেঁদে ফেললে।
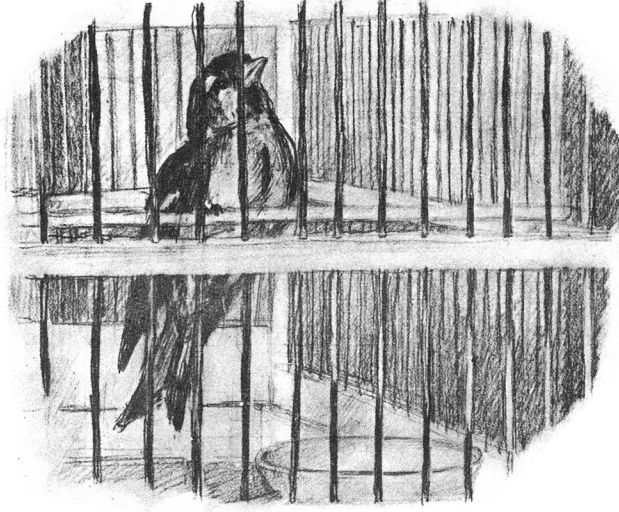
পাখি

সেরিওজার জন্মদিন, নানান উপহার পেল সে, লাটিম, ঘোড়া, ছবি। কিন্তু সবার সেরা উপহার সে পেলে কাকুর কাছ থেকে, পাখি ধরার জাল।

জালটা বানানো এইভাবে: ফ্রেমের সঙ্গে একটা বোর্ড, তারপর জাল। বোর্ডে দানা ছড়িয়ে পেতে রাখতে হবে আঙিনায়। পাখি উড়ে এসে বোর্ডে বসলেই বোর্ড উলটে যাবে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে জাল।

ভারি খুশি হল সেরিওজা, জালটা দেখাতে ছুটে গেল মায়ের কাছে।

মা বলে, 'এ খেলনা ভালো নয়। পাখি নিয়ে কী করবি। কষ্ট দিবি শুধু শুধু।'

'খাঁচায় রাখব। গান গাইবে, খাওয়াব!'

দানা জোগাড় করলে সেরিওজা, বোর্ডে ছড়িয়ে দিয়ে জাল পাতলে বাগানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কখন উড়ে আসে পাখি। পাখিরা কিন্তু ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিল, জালে এসে বসল না।

খেতে গেল সেরিওজা, জালটা ওখানেই রেখে গেল। খাবার পর ফিরে এসে দেখে জালের মুখ বন্ধ, ভেতরে ঝটপট করছে পাখি। খুশি হয়ে সেরিওজা পাখিটি ধরে বাড়ি ফিরল।

'দেখো মা দেখো! পাখি ধরেছি, নিশ্চয় নাইটিঙ্গেল! কী রকম বুক ধুকপুক করছে!'

মা বললে, ‘এটা সিসকিন। আহা, কষ্ট দিস নে, বরং ছেড়ে দে।’

‘উঁহু, আমি ওটাকে দানাপানি খাওয়াব।’

সিসকিনকে খাঁচায় রাখলে সেরিওজা, দিন দুই দানা দিলে, জল দিলে, খাঁচা পরিষ্কার করলে, তৃতীয় দিন কিন্তু সে পাখির কথা ভুলে গেল, জল বদলানো হল না। মা বললে:

‘দেখেছিস তো, পাখির কথা তোর মনে নেই, ছেড়ে দে ওকে।’

‘উঁহু, আর ভুলব না, এখুনি জল দিচ্ছি, খাঁচা পরিষ্কার করছি।’

খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল সেরিওজা, পাখিটা কিন্তু ভয় পেয়ে ডানা ঝটপট করতে লাগল। সেরিওজা খাঁচা পরিষ্কার করে জল আনতে গেল।

মা দেখল, ছেলে খাঁচা বন্ধ করতে ভুলে গেছে, চেঁচিয়ে বললে:

'খাঁচা বন্ধ কর সেরিওজা, নইলে উড়ে পালাতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে মরবে পাখিটা!'

বলতে না বলতেই পাখিটা দরজা খোলা পেয়ে খুশি হয়ে উড়ে গেল ঘর পেরিয়ে জানলার দিকে, কিন্তু জানলার কাঁচ দেখতে পেল না, শার্সিতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল জানলার বাজুতে।

ছুটে এল সেরিওজা, তুলে নিয়ে খাঁচায় পুরলে। পাখিটা তখনো বেঁচে, কিন্তু বুক থুবড়ে ডানা এলিয়ে পড়ে রইল, কষ্ট হচ্ছিল নিঃশ্বাস ফেলতে। চেয়ে চেয়ে দেখল সেরিওজা, তারপর কাঁদতে লাগল।

'মা, এবার কী করি বল না?'

'এখন আর কিছু করার নেই।'

সারা দিন খাঁচা ছেড়ে নড়ল না সেরিওজা, কেবলি চেয়ে রইল পাখিটার দিকে, পাখি কিন্তু বুক থুবড়ে ওইভাবেই শুয়ে রইল, নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন। সেরিওজা যখন ঘুমতে গেল, পাখিটা তখনো বেঁচে। অনেকখন ঘুম এল না তার। যতবারই চোখ বোজে ততবারই পাখির ছবিটা মনে হয়, কীভাবে শুয়ে শুয়ে ধুকপুক করছে পাখিটা।

সকাল বেলায় খাঁচাটার কাছে এসে সেরিওজা দেখল পাখিটা চিত হয়ে পড়ে আছে, শিটিয়ে কাঠ-কাঠ হয়ে আছে পা।

সেই থেকে সেরিওজা কখনো পাখি ধরে নি।
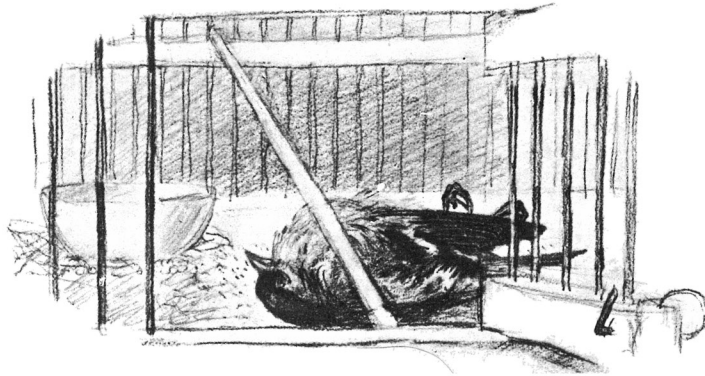
মিথ্যাবাদী

ভেড়া পাহারা দেয় ছেলেটি, নেকড়ে দেখেছে ভান করে ডাকতে লাগল, 'নেকড়ে, নেকড়ে, শিগগির এসো তোমরা!'

চাষীরা ছুটে এসে দেখে, কিছুই নয়। এইভাবে বার দুই তিন করার পর সত্যিই একদিন নেকড়ে এল।

ছেলেটা চেঁচাতে লাগল, 'এসো শিগগির, নেকড়ে!'

চাষীরা ভাবলে, বরাবরের মতো তামাসা করছে। তাই কেউ এল না।

নেকড়ে দেখলে ভয়ের কিছু নেই, নির্বিঘ্নে গোটা পাল ছারখার করলে সে।

দুই সঙ্গী

বনে গেছে দুই সঙ্গী, তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে এল ভালুক। একজন ছুট লাগাল, গাছে উঠে লুকিয়ে রইল। অন্য জন পড়ে রইল পথেই। কোনো উপায় ছিল না তার, মাটির ওপর সটান হয়ে সে মড়ার ভান করে রইল।

ভালুক এসে তাকে শুঁকতে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল লোকটা।

মুখ শুঁকে মরা ভেবে চলে গেল ভালুক।

ভালুক চলে যেতে প্রথম লোকটা গাছ থেকে নেমে হাসতে লাগল।

বললে, 'তা ভালুকটা তোর কানে কানে কী বললে শুনি?'

'বললে, বিপদের সময় যারা সঙ্গীকে ছেড়ে পালায় তারা খারাপ লোক।'

রাজহাঁস

পৃথিবীর শীতাঞ্চল থেকে উষ্ণাঞ্চলে ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে রাজহাঁস। উড়ছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। দিন রাত উড়ে চলল তারা, পরের দিন পরের রাতও না থেমে উড়ে চলল জলের ওপর দিয়ে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, আর অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে নীল জল। রাজহাঁসেরা সবাই একেবারে অবসন্ন, তবু না থেমে উড়ে চলল তারা। সামনে উড়ছে বয়স্ক, শক্তসমর্থ হাঁসেরা, যাদের বয়স কম, দুর্বল, তারা উড়ছে পেছনে।

অল্পবয়সী একটি হাঁস উড়ছিল সবার পেছনে। শক্তি ওর কমে এসেছিল। ডানা নাড়ে, কিন্তু উড়তে আর পারে না। তখন সে ডানা মেলে নামতে লাগল নিচে। ক্রমাগত কাছিয়ে আসছে জল আর সঙ্গীরা তার ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে ধু-ধু জ্যোৎস্নায়।

জলে পড়ল হাঁস, ডানা গুটিয়ে নিলে। সমুদ্র ফুঁসে উঠে দোলাতে লাগল তাকে। জ্বলজ্বলে আকাশে একটা সাদা রেখার মতো আবছা দেখা যায় হাঁসের ঝাঁকটাকে। গভীর নীরবতায় আবছা একটু শোনা যায় তাদের ডানার শব্দ। একেবারেই যখন চোখের আড়াল হল, তখন রাজহাঁসটি তার গ্রীবা পেছনে বাঁকিয়ে চোখ বুজল।

একটুও নড়ল না সে, শুধু একটা প্রশস্ত জলতল দুলিয়ে দুলিয়ে সমুদ্র তাকে ওঠালে নামালে।

সূর্য ওঠার আগে হালকা হাওয়ায় দুলতে লাগল সাগর। হাঁসের সাদা বুকে ছলকে লাগে জল। চোখ মেলল হাঁস। পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে ঊষায়, চাঁদ তারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

নিঃশ্বাস ফেললে হাঁস, গলা টান করে জলে পাখার ঝাপট মেরে উড়ে গেল। উঁচুতে আরো উঁচুতে উঠতে লাগল সে, তারপর জল যখন একেবারে নিচে, তখন উড়তে লাগল সামনের দিকে, সেই দিকে যেখানে গরম দেশ। রহস্যঘন জলের ওপর একা একা সে উড়ে চলল সেই দিকে যেদিকে গেছে তার সঙ্গীরা।

এক ভারতীয়র হাতি ছিল। লোকটা তাকে ভালো করে খাওয়াত না, খাটাত বেশি। হাতি একদিন রেগে মনিবকে পায়ে পিষে দিলে। মারা গেল লোকটা। তার বৌ তখন কাঁদতে লাগল, নিজের ছেলেমেয়েদের হাতির পায়ের নিচে ফেলে দিয়ে বললে, ‘বাপকে মেরেছিস হাতি, এদেরও মার।’ হাতি ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর বড়ো ছেলেটিকে শুঁড়ে করে আস্তে আস্তে তুলে বসালে নিজের ঘাড়ের ওপর। ছেলেটির বাধ্য হয়ে উঠল হাতি, খাটতে লাগল তার জন্যে।
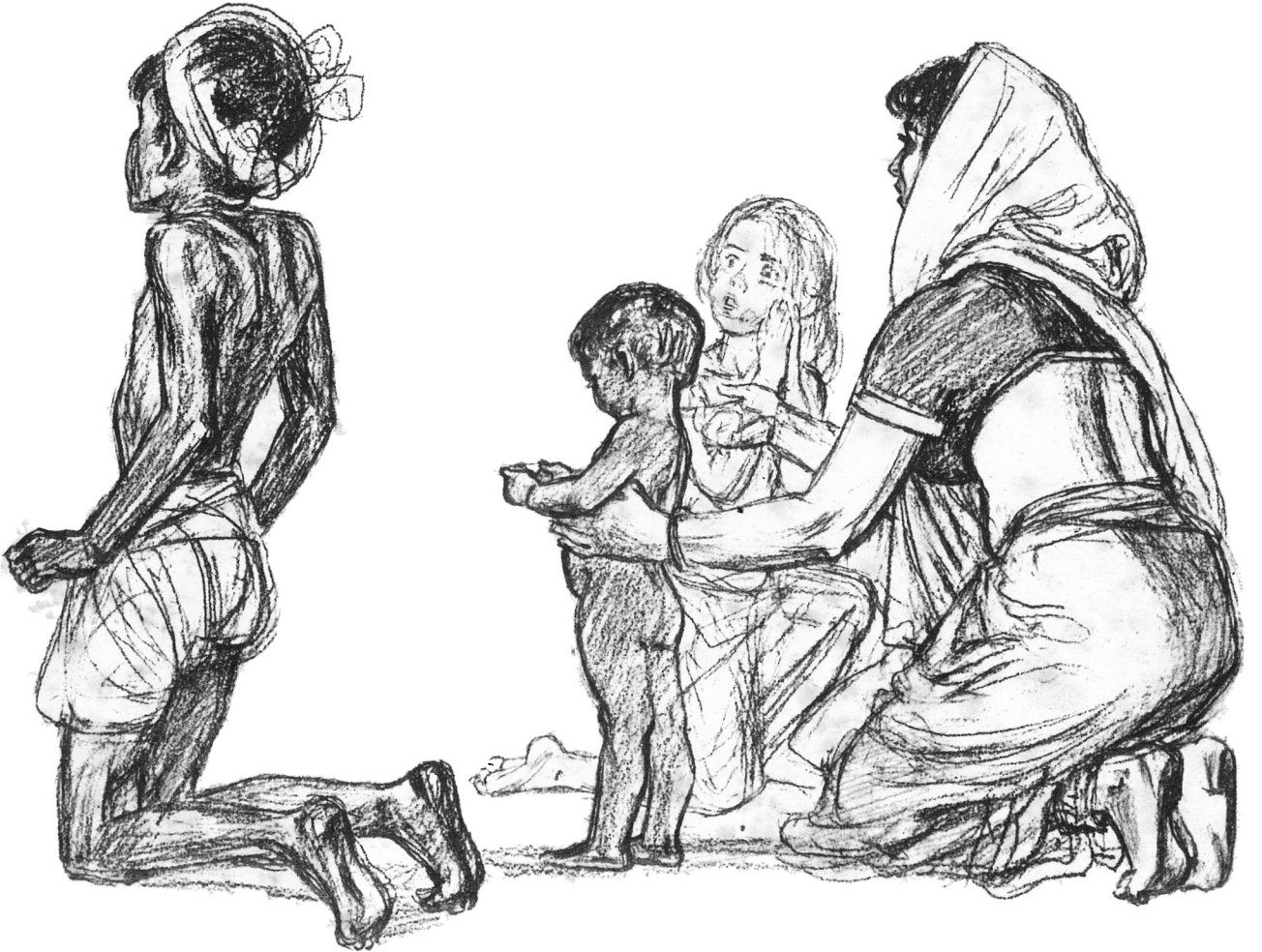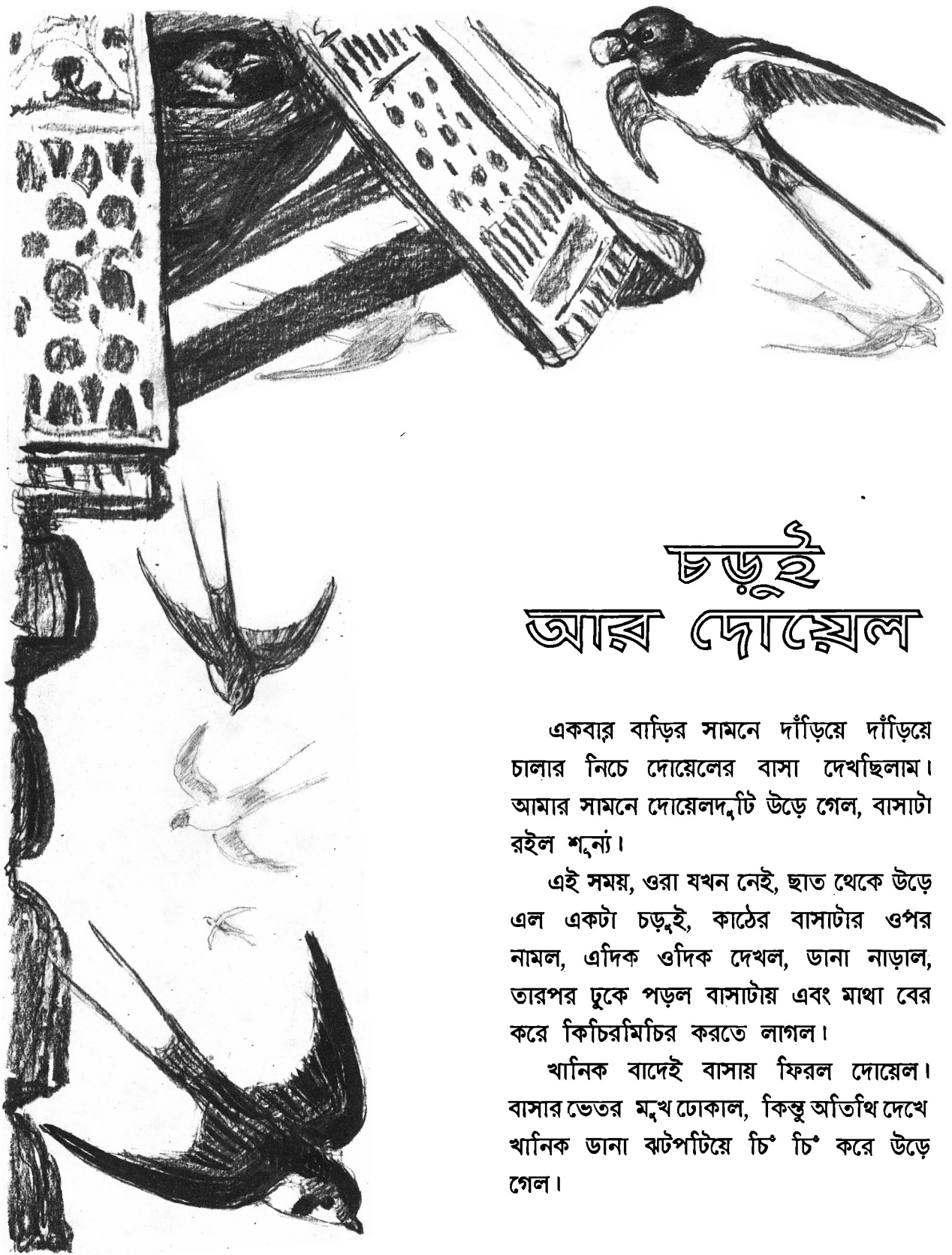
চড়ুই আর দোয়েল

একবার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চালার নিচে দোয়েলের বাসা দেখছিলাম। আমার সামনে দোয়েলদুটি উড়ে গেল, বাসাটা রইল শূন্য।

এই সময়, ওরা যখন নেই, ছাত থেকে উড়ে এল একটা চড়ুই, কাঠের বাসাটার ওপর নামল, এদিক ওদিক দেখল, ডানা নাড়াল, তারপর ঢুকে পড়ল বাসাটায় এবং মাথা বের করে কিচিরমিচির করতে লাগল।

খানিক বাদেই বাসায় ফিরল দোয়েল। বাসার ভেতর মুখ ঢোকাল, কিন্তু অতিথি দেখে খানিক ডানা ঝটপটিয়ে চিঁ চিঁ করে উড়ে গেল।

বসে বসে কিচিরমিচির করল চড়ুই।

হঠাৎ উড়ে এল ঝাঁক বেঁধে দোয়েল। সবাই উড়তে লাগল বাসাটার কাছে, যেন একবার দেখতে চায় চড়ুইটাকে। তারপর ফের উড়ে গেল।

চড়ুই ভয় পেলে না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিচিরমিচির করে চলল।

দোয়েলের দল ফের উড়ে এল বাসায়। কী যেন করে উড়ে গেল।

এবার ওরা খামকা আসে নি। সকলের ঠোঁটে খানিকটা করে মাটি, বাসায় ঢোকার গোল ফুটোটায় তারা একটু করে মাটি চাপিয়ে গেল।

ফের উড়ে গেল তারা, ফের এল, মাটির পর মাটি চাপাতে লাগল, ফুটোটা ছোটো হয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত।

প্রথমে চড়ুইয়ের গলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, তারপর শুধু মাথাটা, তারপর ঠোঁটটুকু, তারপর আর কিছুই দেখা গেল না। বাসাটা একেবারে বন্ধ করে উড়ে গেল দোয়েলগুলো, শিস দিয়ে পাক খেতে লাগল বাড়িটার চারপাশে।

ঈগল

সমুদ্র থেকে দূরে, বড়ো সড়কের কাছে বাসা বাঁধলে ঈগল, ডিম পাড়লে।

একদিন গাছের তলে কাজ করছে লোকে, নখে করে মস্ত এক মাছ নিয়ে বাসায় এল ঈগল। মাছ দেখে লোকে গাছটা ঘেরাও করে হল্লা শুরু করে দিলে, ঢিল ছুড়তে লাগল।

মাছ ফেলে দিলে ঈগল, কুড়িয়ে নিয়ে লোকজনও চলে গেল।

বাসার ধারে বসল ঈগল, ঈগলছানারা মাথা তুলে চিঁ চিঁ করতে লাগল, খাবার চাইছিল।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ঈগল, ফের সমুদ্রে উড়ে যাবার শক্তি ছিল না। বাসায় নেমে ঈগল ডানা দিয়ে ঢাকলে বাচ্চাদের, আদর করতে লাগল, রোঁয়ায় ঠোঁট বোলাল, যেন বলতে চায় একটু ধৈর্য ধরুক। কিন্তু যত আদর করতে লাগল, বাচ্চাদের চিঁ চিঁও ততই বেড়ে উঠল।

ঈগল তখন বাসা থেকে উড়ে গিয়ে বসল গাছের শিখরে।

আরো করুণ হয়ে উঠল ছানাদের কিচিরমিচির।

ঈগল তখন নিজেই হঠাৎ একটা তীক্ষ্ম চিৎকার করে ডানা মেলে কষ্টে উড়ে গেল সমুদ্রে।

ফিরল সন্ধ্যার দিকে, উড়ে এল আস্তে করে, নিচু হয়ে, নখে ফের একটা বড়ো মাছ।

গাছটার কাছে এসে চেয়ে দেখলে আশেপাশে লোক আছে কিনা, তারপর ডানা মুড়ে বসল বাসার কিনারে।

ঈগলছানারা মাথা তুলে হাঁ করলে, ঈগল মাছ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াতে লাগল।

হাঙর

আফ্রিকার উপকূলে নোঙর পেতেছিল আমাদের জাহাজ। দিনটা চমৎকার, সমুদ্র থেকে তাজা হাওয়া বইছিল; কিন্তু সন্ধ্যের দিকে আবহাওয়া বদলে গেল: গুমোট শুরু হল, ঠিক একেবারে জ্বলন্ত চুল্লির মতো লু বইতে লাগল সাহারা থেকে।

সূর্যাস্তের আগে ক্যাপ্টেন ডেকে এসে হাঁকলে, 'স্নান করে নিন সবাই!'

মুহূর্তের মধ্যেই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নাবিকেরা, সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের পাল নামিয়ে বেঁধে ফেললে, পাল দিয়েই তৈরি হল একটা স্নানের জায়গা।

জাহাজে আমাদের সঙ্গে ছিল দুটি ছেলে। ওরাই সবার আগে ঝাঁপ দিলে জলে। কিন্তু পাল ঘেরা জায়গায় অসুবিধা হচ্ছিল ওদের, ঠিক করলে খোলা সাগরে সাঁতারের পাল্লা দেবে।

দুজনেই টিকটিকির মতো গা টান করে প্রাণপণে সাঁতরে যেতে লাগল নোঙরের ওপর ভাসমান পিপেটার দিকে।

একটা ছেলে প্রথমে তার সঙ্গীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু পরে পিছিয়ে পড়তে লাগল। ছেলেটির বাপ পুরনো গোলন্দাজ, ডেকে দাঁড়িয়ে নিজের ছেলেটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ছেলেটি যখন পিছিয়ে পড়তে লাগল, বাপ তখন চেঁচিয়ে বললে, 'ছাড়িস না, কষে লাগা!'

হঠাৎ ডেকের ওপর কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঙর! হাঙর!'

জলের মধ্যে সবাই আমরা সামুদ্রিক রাক্ষসটার পিঠ দেখতে পেলাম।

হাঙরটা তেড়ে যাচ্ছিল সোজা ছেলেদের দিকে।

'ফিরে আয়! ফিরে আয়! হাঙর!' চেঁচিয়ে উঠল গোলন্দাজ। কিন্তু ছেলেদুটোর কানে গেল না, সাঁতরেই চলেছে তারা, হাসছে, ডাকাডাকি করছে আগের চেয়েও ফুর্তিতে, জোরে।

গোলন্দাজ তখন কাগজের মতো ফ্যাকাশে, নিথর হয়ে চেয়ে রইল ছেলেদের দিকে।

মাঝিমাল্লারা নৌকো নামালে, লাফিয়ে উঠে সতেজে দাঁড় টেনে প্রাণপণে এগোল ছেলেদুটির দিকে। কিন্তু হাঙর ততক্ষণে ওদের কাছ থেকে কুড়ি হাতও দূরে নয়, নৌকো অনেক পেছনে।

চিৎকার করে ছেলেগুলোকে যা বলা হচ্ছিল সেটা তারা প্রথমটা শুনতে পায় নি, হাঙরও দেখে নি। কিন্তু একটা ছেলে ফিরে তাকাল, সবাই আমরা একটা মর্মভেদী আর্তনাদ শুনলাম, ছেলেদুটো ভিন্ন ভিন্ন দিকে সাঁতরাতে লাগল।

আর্তনাদটায় যেন জেগে উঠল গোলন্দাজ। হুড়মুড় করে সে ছুটে গেল কামানগুলোর দিকে। চাকা ঘুরিয়ে, কামান তাক করে সে সলতে টেনে নিল।

জাহাজে আমরা যত লোক ছিলাম সবাই ভয়ে হিম অপেক্ষা করতে লাগলাম কী হয়।

গোলা দাগার আওয়াজ শোনা গেল, দেখলাম দুই হাতে মুখ ঢেকে কামানের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল গোলন্দাজ। হাঙর আর ছেলেদুটির কী হল তা দেখা গেল না, কেননা সেই মুহূর্তে ধোঁয়ায় চোখ ঢেকে গিয়েছিল আমাদের।

জলের ওপর থেকে ধোঁয়াটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন চারিদিক থেকে শোনা গেল একটা মৃদু গুঞ্জন, গুঞ্জনটা বেড়ে উঠল ক্রমশ, তারপর চারিদিক থেকে ফেটে পড়ল একটা তীব্র উল্লাসধ্বনি।

মুখ থেকে হাত সরালে গোলন্দাজ, মাথা তুলে চাইলে সমুদ্রের দিকে।

তরঙ্গে দোল খাচ্ছে মরা হাঙরের হলদে লাসটা। মিনিট কয়েক পরেই নৌকো পেঁছিল ছেলেদুটির কাছে, ফিরিয়ে নিয়ে এল জাহাজে।

ঝাঁপ

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে একটা জাহাজ ঘরে ফিরছিল। শান্ত আবহাওয়া, সবাই এসে জুটেছে ডেকে। লোকজনের মধ্যে ছিল একটা মস্ত বাঁদর, সবাই মজা দেখছিল। বাঁদরটা অঙ্গভঙ্গি করছিল, লাফাচ্ছিল, মজাদার ভেঙচি কাটছিল, নকল করছিল মানুষগুলোর, বোঝা যায় বাঁদরটা জানত যে লোকে তাকে নিয়ে মজা পাচ্ছে, তাই তার ন্যাকামিও ক্রমেই বেড়ে উঠছিল।

হঠাৎ সে লাফিয়ে এল বারো বছরের একটি ছেলের দিকে, এটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের ছেলে। তার মাথা থেকে টুপি ছিনিয়ে নিজে পরলে, তারপর চট করে উঠে বসল মাস্তুলে। সবাই হেসে উঠল, আর টুপি হারিয়ে ছেলেটি বুঝে উঠতে পারছিল না হাসবে নাকি কাঁদবে।

বাঁদরটা বসলে মাস্তুলের প্রথম আড়কাঠটায়, টুপিটা নিয়ে দাঁতে নখে ছিঁড়তে লাগল। মনে হল যেন ছেলেটার পেছনে লেগেছে সে, তার দিকে চাইতে লাগল, ভেঙচি কাটতে লাগল। ছেলেটা শাসালে, হাঁক দিলে, কিন্তু বাঁদরটা আরো নষ্টামি করে টুপি ছিঁড়তে লাগল। হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলে মাঝিমাল্লারা। ছেলেটা লাল হয়ে কোর্তা খুলে ফেলে দিলে। বাঁদরটাকে তাড়া করে উঠতে লাগল মাস্তুল বেয়ে। এক মিনিটের মধ্যেই সে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ল প্রথম আড়কাঠটায়; বাঁদরটা কিন্তু আরো ক্ষিপ্র, চটপটে, ছেলেটা যেই তার টুপিটা ধরতে যাবে সেই মুহূর্তে সে উঠে গেল আরো ওপরে।

'যতই কর, পালাবি কোথায়!' এই বলে ছেলেটা উঠল আরো ওপরে।

বাঁদরটাও ফের তাকে লোভানি দেখিয়ে উঠে গেল আরো উঁচুতে, কিন্তু ছেলেটাও ক্ষেপে উঠেছিল, থামল না। এইভাবে ছেলেটা আর বাঁদরটা একই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছল একেবারে ওপরে। সেখানে গিয়ে বাঁদরটা শরীর টান করে এক হাতে দড়ি আঁকড়ে টুপিটা ঝুলিয়ে দিলে শেষ আড়কাঠের কিনারে। আর নিজে একেবারে মাস্তুলের ডগাটিতে বসে অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল, ফূর্তি করতে লাগল দাঁত দেখিয়ে। আড়কাঠের কিনারে যেখানে টুপিটা ঝুলছিল সেটা মাস্তুল থেকে হাত তিনেক দূরে, তাই মাস্তুল আর দড়িটা ছেড়ে না দিয়ে সেখানে পৌঁছনো যায় না।

কিন্তু ভয়ানক একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসল ছেলেটাকে। মাস্তুল ছেড়ে সে আড়কাঠটায় এগিয়ে গেল। বাঁদর আর ক্যাপ্টেনের ছেলে, দুটি মিলে যা করছিল ডেকের সবাই তা দেখে হাসছিল। কিন্তু যখন দেখল ছেলেটা দড়ি ছেড়ে দুহাত শূন্যে দুলিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে আড়কাঠ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে, তখন সবাই আতঙ্কে নিথর হয়ে গেল।

একবার পা ফসকালেই হল, পড়ে গিয়ে ডেকের ওপর একেবারে থেঁতলে যাবে। পা যদি বা নাও ফসকায়, আড়কাঠটার কিনার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে টুপিটা যদি নিতেও পারে, তাহলেও সেখান থেকে ঘুরে মাস্তুল পর্যন্ত ফিরে আসা মুশকিল। সবাই স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে, কী হয়।

লোকজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ হায় হায় করে উঠল কে যেন। তা শুনে ছেলেটার সম্বিৎ ফিরল, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখেই টলতে লাগল সে।

এইসময় ছেলেটির বাবা, জাহাজের ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এল কেবিন থেকে, হাতে তার গাংচিল মারার বন্দুক। মাস্তুলের ওপর ছেলেকে দেখতে পেয়েই সে ছেলের দিকে বন্দুক তাক করে চেঁচিয়ে উঠল:

'জলে ঝাঁপ দে! এখুনি ঝাঁপ দে জলে! নইলে গুলি করব!'

ছেলেটা টলতে লাগল, কিছু বুঝতে পারল না।

'ঝাঁপ দে এখ্খুনি, নইলে গুলি করছি!.. এক... দুই...' বাপ তিন বলতেই ছেলেটা মাথা নুইয়ে লাফ দিলে।

ঠিক কামানের গোলার মতোই ছেলেটার দেহটা এসে নিক্ষিপ্ত হল সমুদ্রের মধ্যে, ঢেউয়ে তা ঢাকা পড়তে না পড়তেই জন কুড়ি জোয়ান মাল্লা জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ল জলে। সেকেন্ড চল্লিশ কাটল—সকলের মনে হল অনেকখন—ভেসে উঠল ছেলেটার দেহ। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল জাহাজে। মিনিট কয়েক বাদে নাক মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল ছেলেটার, নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

তাই দেখে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন, মনে হল কেউ বুঝি তার গলা টিপে ধরেছে, নিজের কেবিনে ছুটে গেল সে—কেউ যেন না দেখে তার কান্না।

সিংহ আর কুকুর

লণ্ডনে বুনো জানোয়ার দেখানো হচ্ছিল, দেখবার জন্যে পয়সা দিতে হত, নয় দিতে হত কুকুর বেড়াল—বুনো জানোয়ারের খাদ্য হিশেবে।

একটি লোকের দেখার শখ হল: রাস্তা থেকে একটা কুকুর ধরে সে চিড়িয়াখানায় এল। লোকটা ঢুকতে পেলে, আর কুকুরটাকে ফেলে দেওয়া হল সিংহের খাঁচায় খাবার হিশেবে।

লেজ গুটিয়ে কুকুর সরে গেল একেবারে কোণের দিকে। সিংহ তার কাছে গিয়ে শুঁকে দেখল।

চিত হয়ে শুয়ে পা তুলে লেজ নাড়াতে লাগল কুকুরটা

সিংহ থাবা দিয়ে উলটে দিল ওকে।

কুকুরটা লাফিয়ে উঠে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল সিংহের সামনে।

কুকুরের দিকে চাইল সিংহ, এদিক ওদিক মাথা ঘোরাল, কিন্তু ছুঁলে না।

সিংহকে যখন মাংস ছুঁড়ে দেওয়া হল, সিংহ তখন মাংসের খানিকটা টুকরো ছিঁড়ে রেখে দিলে কুকুরটার জন্যে।

রাতে সিংহ যখন শুল তখন কুকুরটিও তার কাছেই শুল তারই থাবায় মাথা রেখে।

সেই থেকে সিংহের সঙ্গে একই খাঁচায় ছিল কুকুরটা। সিংহ তাকে কিছু করত না, যে খাবার দেওয়া হত তাই খেত, একসঙ্গে ঘুমত, মাঝে মাঝে খেলতও একসঙ্গে।

একদিন মনিব চিড়িয়াখানায় এসে কুকুরটিকে দেখে চিনতে পারল। বললে, কুকুরটা তার নিজের, চিড়িয়াখানার মালিককে বললে ফিরিয়ে দিতে। মালিকও ফিরিয়ে দিতেই চেয়েছিল, কিন্তু খাঁচা থেকে বার করবার জন্যে কুকুরটাকে ডাকতেই সিংহটা কেশর ফুলিয়ে গর্জন করে উঠল।

এইভাবে সিংহ আর কুকুর গোটা বছর একই খাঁচায় দিন কাটালে।

একবছর পরে অসুখ হল কুকুরটার, মারা গেল। খাওয়া বন্ধ করলে সিংহটা, কেবলি শোঁকে কুকুরটাকে, চাটে, থাবা দিয়ে নাড়া দেয়।
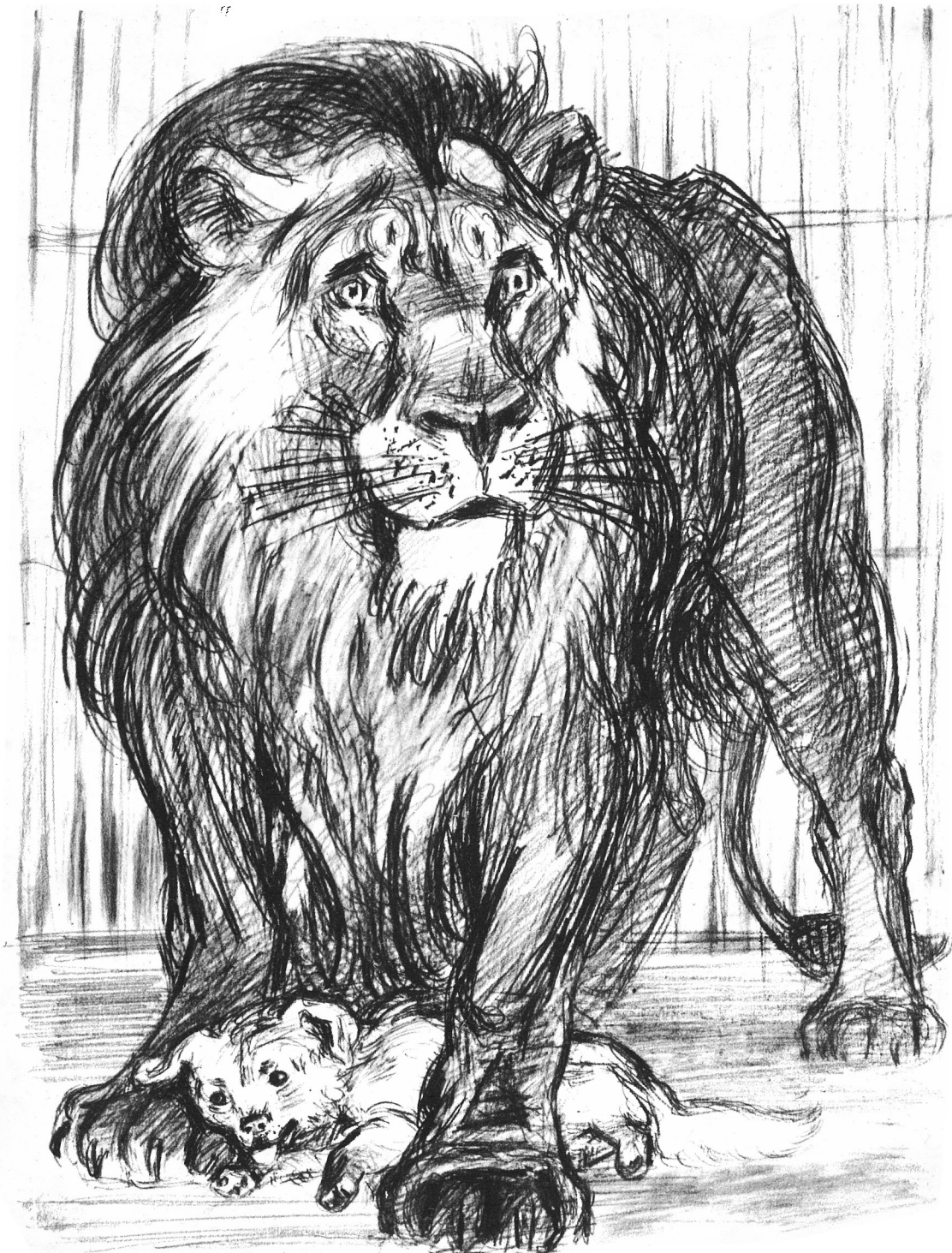
যখন টের পেল কুকুরটা মারা গেছে, তখন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, কেশর ফুলিয়ে ল্যেজের ঝাপটা মারতে লাগল নিজের গায়ে, খাঁচার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা মেঝে কামড়াতে লাগল।

সারা দিন সে লড়লে, দাপাদাপি করলে খাঁচায়, গর্জন করলে, তারপর মরা কুকুরটার পাশে শুয়ে শান্ত হল। মালিক চেয়েছিল মরা কুকুরটাকে বার করে আনবে, কিন্তু সিংহ কাকেও ঘেঁষতে দিল না।

মালিক ভেবেছিল, অন্য একটা কুকুর পেলে হয়ত সিংহটার দুঃখ যাবে; তাই জীবন্ত আরেকটা কুকুর ছেড়ে দিলে খাঁচায়। সিংহ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই টুকরো টুকরো করে ফেললে তাকে। তারপর আগেকার মরা কুকুরটিকে থাবায় জড়িয়ে শুয়ে রইল পাঁচ দিন।

ছয় দিনের দিন মারা গেল সিংহ।

সূচি

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union